Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 80-88
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব : নীতিশাস্ত্রে একটি অপরিহার্য অন্তর্ভুক্তি

Prasanta Sarkar
Assistant Professor, Department of Philosophy, The University of Burdwan

Abstract

Care and its ethical dimensions are such things to ethics without which no ethical judgement is made. Some western critics especially feminists imagine. According to them since ethics has its practical implication and thus to talk about morality merely on its theoretical level as mainstream ethics concerned with is defective. Not only traditional ethics is concerned with abstract moral principles that give emphasis on universality, impartiality, etc. but they shown a little concern to women's morality, i.e. the caring relationship of which woman is associated with. This element of care gives rise to in modern feminist ethics as Care Ethics. To establish this new ethics is a step forward to give recognition to women and their associated feminine traits which are being shown as devalued in mainstream ethics. As traditionally women are focused to serve others' needs, they have grown of having a kind of caring element which men lack. Feminist's proposal is that this care can be extended to the rest of human beings and necessary for everyone to acquire it for making any intimate human relationship. And as moral philosophy is mainly concerned for the good of human being, they concede that a person would be treated as morally good if he or she does acquire and practice this element of care in addition to other moral elements while making any moral decisions. An attempt has been made in this paper to give a brief introduction to care ethics, and its significance of inclusion into the mainstream ethics not simply as occupying space in the domain of morality but as a practical necessity of taking moral decisions.

Key words: Care ethics, attentiveness, responsibility, competence, responsiveness, mainstream ethics.

ভূমিকা: সাধারণত মানুষ তার জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করে একে অপরের প্রতি প্রযত্ন প্রদান ও গ্রহণের মধ্যে দিয়ে, এবং প্রত্যেক মানব সত্তার মঙ্গলসাধন যেহেতু নীতিদর্শনের লক্ষ্য তাই নীতিবিদ্যায় প্রযত্নের গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য। তবে খুব অল্প সংখ্যক নীতি দার্শনিকই প্রযত্নের নীতি আলোচনায় আগ্রহী হয়েছেন, এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী হয়েছেন নারীবাদীরা। সাধারণভাবে মনে করা হয় নীতিশাস্ত্রের কাজ হল নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের আচার-আচরণের নৈতিক বিচার করা। কিন্তু নারীবাদীদের মত হল সাবেকি নীতিশাস্ত্র নারীর নৈতিক অভিজ্ঞতাকে কম গুরুত্ব দিয়েছে এবং নারীর সহজাত যে প্রযত্ন, আবেগ, বিশেষত্ব, ইত্যাদিকে কম মূল্যবান বলে মনে করা হয়েছে। একজন আমেরিকান নারীবাদী অ্যালিসন জাগর (Alison Jaggar 1942-) যেমন

দেখিয়েছেন যে সাবেকি নীতিবিদ্যায় পুরুষের তুলনায় নারীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক স্তরে রান্না-বান্না, শিশু ও অসুস্থদের যত্নআত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালি কাজকর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিকে নৈতিকভাবে গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং সেইসংক্রান্ত আলোচনা বাতিল করেছে। আবার, নারী পুরুষের ন্যায় নৈতিক বিচারে সমকক্ষ নয় –সাবেকি নীতিবিদ্যায় এরকমও ভাবা হয়েছে। এই নীতিচর্চায় স্বাতন্ত্র্য, মন, যুক্তি-বুদ্ধি, স্বাতিক্রান্তি প্রভৃতি কথিত পুরুষালি বৈশিষ্ট্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পরস্পর নির্ভরতা, সম্প্রদায়-প্রীতি, দেহ, আবেগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে মেয়েলি বলে হতশ্রদ্ধা করা হয়েছে। এতদিন ধরে চলে আসা পুরুষসুলভ নীতিবিচার যা নিয়ম-নীতি, সার্বিকতা, নিরপেক্ষতা, ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত —তার গুণগান করেছে। বিপরীতে, নারীর নীতিভাবনা, যার মধ্যে আন্তর্সম্পর্ক, আবেগ, বিশেষত্ব, এমন কি কখনো কখনো পক্ষপাতও গুরুত্ব পায়, তাকে বাঁকা চোখে দেখা হয়েছে[১]। নারীবাদীদের মূল বক্তব্য হল সাবেকি নীতিশাস্ত্রের নারীর প্রতি এইসব সীমাবদ্ধতা উচ্ছেদকল্পে নীতিশাস্ত্রের নৈতিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটানোর প্রয়োজন। আর এইখানেই প্রয়ত্নের নীতিশাস্ত্রের উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তা।

যাইহোক, সাবেকি ভাবনায় একথা বলা হয় যে নারীর নৈতিকতার সাথে এই প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর এটাই প্রযত্নের নীতিকে এক স্বতন্ত্র নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, প্রযত্নকে যদি এইভাবে নারীর প্রকৃতি সঞ্জাত প্রযত্নের সঙ্গে জুড়ে দেখা হয়, তাহলে প্রযত্ন হয়ে পড়ে নারীর সহজাত কিংবা কোনো এক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আচার আচারণ, এবং আদপে তা অপরব্যক্তির নৈতিক পছন্দের পরিসরের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে যদিও প্রযত্নের উপাদানের উৎসমূলে নারীর সহজাত অভিজ্ঞতা কিংবা কোনো সামাজিক অভিজ্ঞতা, তথাপি এটা এমন একটা ধারণা যা অন্য সব স্বতন্ত্র নৈতিক ধারণা হিসেবে দেখা প্রয়োজন। প্রযত্নের উপাদান নারীর সহজাত হলেও তা যখন নীতির রূপ পায় তখন তা ব্যক্তিগত পরিসর অতিক্রম করে সার্বিক ও বস্তুগত হয়। তাই প্রযত্নের নীতির অনুশীলন নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। এবং নারীবাদীদের মত হল যেকোনো ব্যক্তি যিনি মননে এবং কর্মে প্রযত্নবান হবেন তিনিই নারীবাদী হবেন। বর্তমান প্রবন্ধে এটা দেখানোর একদিকে যেমন চেষ্টা করেছি যে সাবেকি নীতিশাস্ত্রে এই প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের সংযোজন ব্যক্তির যেকোনো নৈতিক আচার আচারণের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে জরুরী তেমনি আবার দেখিয়েছি যে প্রযত্ন প্রদানকারী নৈতিক দ্যোতনগুলি যেহেতু মানবজীবনের কেন্দ্রে প্রথিত এক অপরিহার্য্য উপাদান তাই সেগুলিকে বাদ দিয়ে মানব জীবনের ভাল বা মঙ্গল সম্ভব নয়।

নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের প্রাথমিক পরিচয়: নারীবাদী নীতিবিদরা নীতিবিদ্যায় বিভিন্ন ধরনের নীতিভাবনা[২] তথা পদক্ষেপের সূচনা করেছে, যেমন নারীসুলভ, মাতৃসুলভ, রাজনৈতিক এবং সমকামী, ইত্যাদি। এই ধরনের নীতি ভাবনাগুলি নীতিবিদ্যায় নারী ও পুরুষের জীবতাত্ত্বিক, সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের উপর আলোকপাত করে। ব্যাক্তিগত কিংবা বাহ্যজগতের বিষয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার পথনির্দেশ এই নারীবাদী নীতিদর্শনে পাওয়া যায়। এগুলি শুধুই নারীর বর্তমান অবদমনের অবস্থার কথাই মনে করায় না, যেসব নৈতিক উপাদান এই অবদমনকে স্থায়িত্ব দিয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করার কথাও বলে। এককথায়, নারীবাদী, নীতিদর্শনের লক্ষ্য হল লিঙ্গসমতাযুক্ত নীতিবিদ্যার সূচনা করা।

যাইহোক, পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের সেইসব প্রকরণ যা নারীর নৈতিক অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করেছে তার পুনর্বিচার এবং সংশোধনের জন্যেই এই নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। যদিও এই নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের কোনো সর্বসম্মত একক ভাষ্য নেই, তথাপি সমস্যাগুলি বিভিন্ন নারীবাদী বিভিন্নভাবে দেখেছেন এবং তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সমাধান খোঁজার ভিন্নতার কারণে নারীবাদী নীতিশাস্ত্রকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিতত্ত্ব, মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিতত্ত্ব ও রাজনৈতিক বা যথার্থ নারীবাদী নীতিতত্ত্ব।

আমরা স্থানাভাবের কারণে এখানে কেবল নারীসুলভ নীতিতত্ত্বটির পর্যালোচনা করব কেননা এই নীতিতত্ত্বের সঙ্গে প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের সরাসরি যোগ রয়েছে।

প্রযত্নের নীতি ও তার পরিশীলন: নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিভাবনার মধ্যে প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব[৩] (care ethics) গুরুত্বপূর্ন। এই নীতিতত্ত্বটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন নারীবাদীদের হাত ধরে জনসমক্ষে তথা বিদ্বজ্জনদের সামনে এসেছে। প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব[৪] হল এমন একটি আদর্শনিষ্ট নীতিতত্ত্ব যা কোনো কাজ নৈতিকভাবে ভাল বা মন্দ তা বিচার করে থাকে। সাবেকি পরিণামবাদী ও কর্তব্যবাদী নীতিতত্ত্বগুলি যেখানে নিরপেক্ষতা ও সার্বিকতার মানদন্ডের উপর জোর দিয়ে থাকেন সেখানে প্রযত্নের নীতিতত্ত্বে প্রতিবেদনশীলতার গুরুত্ব বেশী। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিবর্তন সাধিত হয় যখন আমরা 'what is just?' এই নৈতিক প্রশ্নের পরিবর্তে 'How to respond?' এরকম নৈতিক প্রশ্ন নিয়ে চর্চা করি। উল্লেখ্য 'what is just?' এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সার্বিক নিয়ম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা সাবেকি নীতিবিদ্যার কেন্দ্রে প্রথিত, অন্যদিকে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'How to respond?' এইরকম পরিবর্তন নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল জুড়ে রয়েছে। সেইকারণে প্রযত্নের নীতিতত্ত্বে সাবেকি নীতিশাস্ত্রের মতো সার্বিকীকরণের প্রচেষ্টা আসলে নৈতিক অন্ধত্ব ও ঔদাসীন্যতার জন্ম দেয় বলে নারীবাদীদের মত। যাইহোক, নারীবাদীরা এরকম মনে করেন যে নীতিবান ব্যক্তি হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির অন্যান্য গুণগুলি থাকার সাথে সাথে ব্যক্তির নিজের জীবনে বর্তমান প্রযত্নের দাবিগুলির পূরণও বাঞ্ছনীয়। একইরকমভাবে বলা যায় যে কোনো সমাজব্যবস্থাকে নৈতিকভাবে প্রশংসনীয় বলা যাবে যদি সেটি অন্যান্য অবস্থাগুলি ঠিক রাখার পাশাপাশি সমাজে বসবাসকারী সদস্যদের এবং তাদের পারিপার্শিক পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রযত্ন প্রদানে সক্ষম হয়। তবে আবার এরকম দাবিও ঠিক নয় যে পর্যাপ্তভাবে প্রযত্নবান হওয়া একটি বিশেষ গুণ যা কোনো ব্যক্তি কিংবা সমাজের থেকে প্রাপ্ত। আবার, কেবলমাত্র প্রযত্নবান হলেই যে একজন ব্যক্তি বা সমাজ নীতিবান রূপে বিবেচ্য হয় এমনও নয়। প্রযত্নের প্রতি এরূপ বাধ্যবাধকতার অর্থ এটা নয় যে তা নীতি নৈতিকতার সমস্ত দিক পূরণে সক্ষম। মিথ্যা কথা বলো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, অপরকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকো, ইত্যাদি সব নৈতিক বিধিগুলি নীতি নৈতিকতার যে স্বরূপ তুলে ধরে তা অসম্পূর্ণ, কারণ মানব জীবনের মূখ্য ভূমিকা হল প্রযত্নবান হওয়া তা এইসব বিধিগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে।

যদিও নীতির এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বর্থ্যক বলে মনে হয়। প্রথমত, প্রযত্নে সাফল্য লাভ কিংবা ব্যর্থতা কোনোটারই সাথে নৈতিক দিকগুলির কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, 'প্রযত্নের উপাদান যেমনভাবে উপস্থিত'-এরকম ভাষা ব্যবহার আসলে প্রযত্নবান ব্যক্তিকে প্রযত্ন স্বীকারের বাধ্যবাধকতা থেকে পশ্চাৎগমনে অনুমুতি দেয়। যাইহোক, স্পষ্ট করে বলা যায় যে প্রযত্ন-নীতি কেবল কতকগুলি নিয়ম-নীতির সমষ্টি নয়, বরং এটি এক বিশেষ ধরনের পরিশীলন, যার জন্য প্রয়োজন বিশেষ কিছু নৈতিক গুণের অধিকারী হওয়া। কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে প্রযত্নবান হওয়া এবং কোনো বিষয়ে সাধারণভাবে প্রযত্নবান হওয়া –এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে যিনি প্রযত্নবান হবেন বুঝতে হবে তিনি সাবেকি নীতিশাস্ত্রকে মান্যতা দিচ্ছেন, আর যিনি বিশেষভাবে প্রযত্নবান হন তিনি আসলে আধুনিক নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের আলোকে নিজেকে পরিশীলিত করেছেন। নারীবাদীদের মতে এই দুইরকম প্রযত্নের সম্মীলিত প্রচেষ্টায় কোনো ব্যক্তির নৈতিক জীবনের সমগ্র চিত্র পাওয়া সম্ভব। প্রযত্নের এইসব বিভিন্ন দিকের আলোচনা নিম্নলিখিত অংশে করা হল।

নারী ও পুরুষের জীবতাত্ত্বিক ও সামাজিক তারতম্যের ভিত্তি হল নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র নীতিবোধ, আচরণ এবং পরিচয়। নারী ও পুরুষের মধ্যেকার এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে নারীসূলভ বৈশিষ্ট্যিভিত্তিক নীতিতত্ত্ব তথা প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। মনস্তাত্ত্বিক তথা নীতিবিদ্ ক্যারোল গিলিগান (**Carol Gilligan 1936**-) দেখিয়েছেন যে সাবেকি কায়দায় নারীরা শুধুই অন্যের প্রয়োজনে লাগে – এবং সেদিকেই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি নারীর এক বিশেষ ধরনের ভাষা আবিষ্কার করেছেন যাকে প্রযত্ন বা দরদের ভাষা[৫] (language of care) বলা হয়। তিনি

আরও দাবি করেন, এই ধরনের দরদের ভাষা মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বেশি যত্নশীল হয়। আবার পুরুষ নিজেকে বাহ্যজগতের ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত করে যেমন, ব্যবসায়, চিকিৎসায়, আইনে, ইত্যাদিতে। এই পুরুষের আবিষ্কৃত ভাষা হল ন্যায়নীতির ভাষা (language of justice), যা মানানসই সহমতের উপর জোর দেয়, এবং কেবল নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। গিলিগ্যান আরও উল্লেখ করেন যে লরেন্স কোলবার্গ (**Lawrence Kohlberg 1927-1987**) কৃত নৈতিক উৎকর্ষতার পরিমাপক যে ছয়-মাত্রা স্কেল সেখানে শুধু ন্যায়পরায়ণতার রাজ চলে, দরদের কোন স্থান নেই। সেইকারণে, তাঁর মতে প্রাথমিকভাবে নারীরা কোলবার্গের যে নৈতিক উৎকর্ষের তৃতীয় মাত্রা বা স্তর পর্যন্ত উঠতে পারে। অন্যদিকে, পুরুষরা যারা ন্যায়পরায়ণতার ভাষায় কথা বলে ও নৈতিক বিচার করে, দেখা যায় তারাই কোলবার্গের পঞ্চম স্তর, এমনকি ষষ্ঠ বা সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্তও পৌঁছতে সক্ষম হয়।

গিলিগানের প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব নারীবাদী এইকারণে যে তিনি পুরুষের ন্যায়পরায়ণতার নীতি এবং নারীর প্রযত্নের নীতি উভয়কেই বৈধ বলে মনে করেন। তাঁর প্রস্তাব হল সমস্ত মানুষের উচিত একইসঙ্গে ন্যায়পরায়ণ ও প্রযত্নবান হওয়া। তবে, গিলিগান এবিষয়ে সচেতন যে নারীরা পুরুষের প্রতি নীতিমূল্য প্রদানে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, পুরুষরা নারীর প্রতি নীতিমূল্য প্রদানে ততটা আগ্রহী হন না। তিনি আরও মনে করেন, এই অনিচ্ছার মূল নিহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে; যেখানে পুরুষব্যক্তির প্রকৃতিপ্রদত্ত নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যকে তথা সেই ব্যক্তিকে তথাকথিত মেয়েলী-পুরুষ বলে হতশ্রদ্ধা করা হয়েছে।

বিষয়টি একটু বিশদে বলা যাক[৬]। ১৯৮৩ সালে একটি সমীক্ষা যুগ্মভাবে করেন ক্যারোল গিলিগান ও লরেন্স কোলবার্গ। সমীক্ষাটি হয়েছিল কিছু সংখ্যক বয়ঃসন্ধিকালীন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর দেওয়া সমাধানের ভিত্তিতে তাদের নৈতিক বিচার কতটা পরিণত তা মূল্যায়ন করে দেখার চেষ্টা হয় সমীক্ষাটিতে। এখানে কোলবার্গের সঙ্গে গিলিগানের মূল্যায়নের অনেক তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। কোলবার্গের বিচারে ছাত্ররা নৈতিক বিচারে অনেকবেশী এগিয়ে, আর গিলিগানের বিচারে ছাত্রীরাও এই বিচারে এগিয়ে আছে। আসলে এই দু'জন দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া সমাধানের নৈতিক বিচার করেছেন। কোলবার্গের বিচারধারা ছিল বিমূর্ত তাত্ত্বিক, যাতে ছাত্ররা এগিয়ে। অন্যদিকে গিলিগ্যান বিচারধারার ভিত্তি হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন দরদের ভাষা, যাতে ছাত্রীরা অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। তাই, নৈতিক বিচারের মানদণ্ড হিসেবে যদি বিমূর্ত তাত্ত্বিকতাকে একমাত্র পরিণত মানদণ্ড মনে না করা হয়, কেবল তাহলেই ছাত্র-ছাত্রীদের করা নৈতিক বিচারকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়।

ছাত্র-ছাত্রীদের যে সমস্যাটির সমাধান করতে দেওয়া হয়েছিল তা হল: হাইনজ নামে একজন ব্যাক্তির স্ত্রী অসুস্থ। কিন্তু তাঁর ঔষধ কেনার সামর্থ্য নেই অথচ ঐ ঔষধটা না পেলে হাইনজের স্ত্রী হয়তো মারা যাবে। এমত অবস্থায় প্রশ্ন হল, হাইনজের কি দোকান থেকে ঔষুধ চুরি করা ঠিক কাজ হবে? এইরকম সমস্যার সমাধানে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া জানায়। দেখা যায়, ছাত্ররা এই সমস্যাটিকে একটা বিশেষ সমস্যা হিসাবে না ভেবে তারা সমস্যাটি কোন্ কোন্ নৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলে দেখা দিচ্ছে তা খুঁজতে তৎপর হয়। নৈতিক আদর্শগুলি হল যেমন, 'সৎপথে চল', 'চুরি করো না', 'মানুষের জীবন রক্ষা করবে', ইত্যাদি। এর মধ্যে 'সৎপথে চলা' ও 'জীবন রক্ষা করা' এই দুই নৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বের ফলেই উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা মনে করে। সবশেষে তারা 'জীবনরক্ষা করার' দায়িত্বকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করল এবং সমাধান দিল 'হাইনজের চুরি করাটা অনৈতিক হবে না'। অন্যদিকে, ছাত্রীদের দেওয়া সমাধানগুলি এমন নির্দিষ্ট ছিল না। কেউ জানাল, হাইনজ ঔষধ চুরির দায়ে যদি হাজতে যায় তাহলে তার অসুস্থ স্ত্রীর পাশে কেউ থাকবে না, তাই ঔষধের দাম কমানোর জন্য ঔষধের দোকানের মালিককে পুনরায় অনুরোধ করা যেতে পারে। কেউ আবার প্রস্তাব করল সকলের কাছে চাঁদা তুলে ঔষুধের খরচ মেটানোর, ইত্যাদি। এখানে ছাত্রীরা সমস্যাটির কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাধান দিল না।

কোলবার্গের মতে, ছাত্রীরা ছাত্রদের তুলনায় পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারছে না। আর এখানেই কোলবার্গের সঙ্গে গিলিগানের মত বিরোধ। কোলবার্গের মূল্যায়নের বিষয়টি গিলিগান নতুন উদ্যমে ভাবতে শুরু করেন।

গিলিগানের মনে হল ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকে ছাত্রদের মূল্যায়নের তুলনায় খাটো করে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে, বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক বিচারের প্রবণতার ভিন্ন ধারা বর্তমান। ছাত্রদের বিচার ধারার মধ্যে বিমুর্ত তাত্ত্বিকতার বীজ নিহিত, আর ছাত্রীদের বিচারধারার মধ্যে নিহিত রয়েছে মাতৃসুলভ বা নারীসুলভ যত্ন বা দরদের বোধ, যা সমস্যাগুলিকে আরো ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ভাবতে প্রণোদিত করে। ছাত্রীরা নিছক কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক নীতিতে ততটা আগ্রহী নয়। বলা বাহুল্য, কোনো নৈতিক সমস্যাকে একটিমাত্র তত্ত্ব কাঠামোর আলোকে বিচার করলে ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সম্পর্কের স্তরে তা হয়ে যায় অনেক বেশি কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। নৈতিক সমস্যা যেখানে জীবন্ত সম্পর্ক-নির্ভর, সেখানে এক বিমূর্ত তাত্ত্বিকতার স্তরে তার সমাধান খুঁজলে তা কখনোই উপযুক্ত হয় না। তাই বলা যায় যে গিলিগানের দরদের নীতিশাস্ত্র নারীবাদী এই কারণে যে তিনি নারীর দরদের নীতিতত্ত্বকে পুরুষের ন্যায়পরায়ণতার নীতির চেয়ে কোনোভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বলেন নি। সব মনুষ্যসত্তারই যত্নবান হওয়া উচিত। গিলিগান মনে করেন, পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের নৈতিক মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়।

নেল নোডিংস (**Nel Noddings 1929**-) গিলিগানের তুলনায় অন্যমত পোষণ করেন[৭]। তাঁর বক্তব্য, নীতিবিদ্যা হল দুই ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে প্রযত্ন বা দরদের সম্পর্ক (caring relationship between at least two individuals)। তিনি বলেন, যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ বা যাদের একজন দরদ দেখায়, যত্ন নেয়, অন্যব্যক্তি যত্ন পায়। আর যত্ন নেওয়া মানেই তো একটা মানসিক অনুভূতি যা কারোর প্রতি সহানুভুতি দেখানো বা মনে মনে আগ্রহ দেখানো। এরকম বলা যাবে না যে আমি যেমন আমার নিজের সন্তানদের যত্ন নিই সেই সম পরিমাণ যত্নবান আমি জাপানের শিশুদের প্রতি হই। শুধুমাত্র শুভ অভিপ্রায়ের মাধ্যমেই দরদ দেখানো বা যত্ন নেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে পরই যত্ন নেওয়ার বা দরদ দেখানোর প্রশ্ন ওঠে। সত্যিকারের দরদ দেখানো সেখানেই সম্ভব যেখানে যিনি দরদ দেখান তিনি ব্যক্তি হিসেবে দরদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে গভীরভাবে মিশে যান। অন্যদিকে, দরদপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি দরদ দেখাচ্ছেন তার প্রতি স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানান। যদিও এখানে উভয় পক্ষই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরের সান্নিধ্যে আসে তবেই তা প্রকৃত যত্ন বা দরদ রূপে বিবেচ্য হয়।

তাই আবার নোডিংসের দরদের নীতিতত্ত্বকে নারীবাদী বলা যায় এই কারণে যে এটা নারী ও পুরুষের নৈতিক বিচার করার সক্ষমতার পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। যদিও একথা স্বীকার করা চলে যে পুরুষের মতো নারীরাও অবরোহাত্মক আদর্শনিষ্ঠ যুক্তিবিচার করতে সক্ষম। নোডিংস দাবি করেন যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি তাদের অনুভূতি, চাহিদা আবেগ এবং ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, ইত্যাদি অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, বিশেষ করে, তাঁরা যখন কোনো নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়। নোডিংসের দরদের নীতিশাস্ত্রকে নারীবাদী হিসাবে দেখার আর একটি কারণ হল তাঁর এই নীতিতত্ত্ব অনেক পথনিদেশ দেয়, যেগুলির সাহায্যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো বিষয় যেমন— বাচ্চা শিশুদের যত্ন নেওয়া, প্রাণী উদ্ভিদকুল, সম্পদ এবং বিভিন্ন ধ্যানধারণা সম্পর্কে আরো সজাগ হই।

প্রযত্ন নীতির প্রকরণসমুহ: প্রযত্ন তথা দরদের মূলত চারটি উপাদানের কথা বলা হয় যেমন মনোযোগীত্ব, দায়িত্ববত্তা, সামর্থ্য এবং প্রতিবেদনশীলতা[৮]। যেহেতু প্রযত্নের পশ্চাতে এক নির্দিষ্ট প্রয়োজন থাকে তাই প্রযত্নের প্রথম নৈতিক উপাদান বা স্তর হল মনোযোগীত্ব। আমরা যদি অপরের প্রয়োজনের প্রতি যথার্থ মনোযোগী না হই তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রসঙ্গই ওঠে না। এই মানদন্ড অনুসারে অন্যকে অবহেলা করা এক ধরনের নৈতিক অমঙ্গল বা পাপ। আজকের সমাজে অন্যদের সম্পর্কে জানার এক অতুলনীয় ক্ষমতা আমাদের

রয়েছে, তৎসত্ত্বেও অন্যদের অবহেলা করা, অন্যের প্রতি মনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের ওপরই যাবতীয় চিন্তাকর্মকে কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা প্রায় অপ্রতিরোধ্য। আমাদের চারপাশের মানুষজনের প্রয়োজনকে স্বীকার করা, যাকে মনোযোগীত্ব শিরোনামে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এক কঠিন কাজ। তবে বাস্তবিকই তা করতে পারাটাই নৈতিকতা।

এই মনোযোগীত্বের অভাব এবং তজ্জনিত নৈতিক স্খলন লক্ষ্য করেছেন অনেকে চিন্তাবিদ। বিশেষ করে সেইসব লেখকেরা যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত পৈশাচিকতার দিকে নজর দিয়েছেন। অন্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যে একটি নৈতিক প্রকরণ তা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন দার্শনিক সাইমন উইল (Simone Weil 1909-1943), যিনি বিশ্বাস করেন যে এই ধরনের মনোযোগ সামর্থ্য যথার্থ মানবিয় মিথস্ক্রিয়ার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। উইল বিশ্বাস করেন যে আমাদের শিক্ষাচর্চায় এইরূপ মনোযোগিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রযত্নের মতোই মনোযোগও অন্যনিষ্ঠ। উইলের ভাষায় "Attention consists in suspending thought, leaving it available, empty and ready to be entered by its objects … thought must be empty, waiting, seeking nothing, but ready to receive in its naked truth the object that is about to penetrate it."[৯] অর্থাৎ অপরের জন্য মনোযোগ দিতে গেলে স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে অন্ততঃ সাময়িককালের জন্য হলেও দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় বলা যায়, আমাদের মনোজগতে মুক্ত স্থান এর সুযোগ তৈরি করতে হবে, যাতে করে অন্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপযুক্ত সামর্থ্য ও পরিস্থিতি তৈরি হয়।

দায়িত্ববত্তা: প্রযত্ন বা দরদের দ্বিতীয় স্তর তথা প্রকরণটি হল দায়িত্ববত্তা। অন্যের প্রতি আমাদের দায়িত্বকে স্বীকার করা হল নৈতিকতার অন্যতম প্রকরণ। জোয়ান ট্রোনটোর (Joan Tronto 1952-) মতটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যদিও তিনি এরকম দাবি করেন না যে অন্যান্য নীতিতত্ত্বে দায়িত্বের প্রশ্নটি আলোচিত হয় নি। তিনি যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চান তা হল প্রযত্নের নীতিতত্ত্বে দায়িত্ববত্তার বিষয়টি অবিরাম পূনর্মূল্যায়ন দাবি করে, এদিক থেকে বিচার করলে, এই নীতিতত্ত্বে দায়িত্ববত্তার উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্যান্য সমকালীন নৈতিক তথা রাষ্ট্রনৈতিকতত্ত্বে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সাধারণভাবে, বাধ্যতাবোধকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাকেই (the need to conform to obligation) দায়িত্ববত্তা হিসাবে ভাবা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বসমূহে কিভাবে এই বাধ্যতাবোধ গড়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে আমাদের পূর্বকৃত প্রতিশ্রুতির থেকেই বড় ধরনের বাধ্যতাবোধের উদ্ভব ঘটে।

বাধ্যতাবোধের তুলনায় দায়িত্ববত্তার একটি ভিন্ন ব্যঞ্জনা এবং একটি ভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দায়িত্ববত্তার ধারণাটি যতটা না রাষ্ট্রনৈতিক বা দার্শনিক তার তুলনায় বেশি সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক। দায়িত্ববত্তার একগুচ্ছ আকারগত নিয়ম বা প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের একগুচ্ছ অব্যক্ত বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকে। তৎসত্ত্বেও দায়িত্ববত্তা যেহেতু সাধারণের বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকে তাই এর মধ্যে রাজনৈতিক উপাদানও রয়েছে। যাইহোক, প্রযত্নের প্রসঙ্গে দায়িত্ববত্তা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যদি ছেলে-মেয়ের পিতামাতা হই তাহলে পিতা-মাতা হওয়ার কারণেই আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের যত্ন নিতে হবে। পরিবারের সদস্য হিসেবে বয়োজেষ্ঠ্য আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমরা দায়িত্ব অনুভব করি। একটু গভীরে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে আমরা তখনই দায়িত্ববান হতে চেষ্টা করি যখন আমরা প্রযত্নের প্রয়োজন স্বীকার করি, এবং ভাবি যে এই নির্দিষ্ট প্রয়োজন অন্য কোনোভাবেই পূরণ হবার নয়। ঠিক এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু ইওরোপবাসী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে কেবল মানুষ হওয়ার দরুণই তাদের দায়িত্ব আছে নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে ইহুদী ও অন্যান্যদের উদ্ধার করা। ট্রোনটোর ভাষায় তাই

বলা যায় "We are better served by focusing on a flexible notion of responsibility than we are by continuing to use obligation as the basis for understanding what people should do for each other."[১০]

সামর্থ্য: প্রযত্নের তৃতীয় স্তর তথা প্রকরণটি হল সামর্থ্য। এর অর্থ হল শুধু মনোযোগী হওয়া বা দায়িত্ব অনুভব করাই যথেষ্ট নয়, প্রযত্নরূপ নৈতিক গুণের আর একটি উপাদান হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যত্ন দিতে উপযুক্তভাবে সমর্থ হওয়া। প্রযত্ন দেওয়ার ইচ্ছা বা তৎসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব স্বীকার করলাম, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রযত্ন দিতে পারলাম না—সেক্ষেত্রে শেষমেষ যা দাঁড়াবে তা হল প্রযত্নের প্রয়োজন মেটাতে না পারা। কখনো কখনো প্রযত্ন অপ্রতুল হতে পারে যখন প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা সম্পদের অভাব ঘটে। এই দক্ষতা বা প্রয়োজনীয় সম্পদের অপ্রতুলতার প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে আমাদের সামর্থের ধারণাটিকে বুঝতে হবে। শুধু দায়সারা গোছের দেখভাল করাই যথেষ্ট নয়, প্রযত্ন দেওয়ার কাজটি এমনভাবে সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়, যাতে করে প্রযত্ন সত্যিকারের সাফল্যের মুখ দেখতে পায়।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রযত্নরূপ পরিষেবা দেওয়ার সামর্থ্যের প্রশ্নটি অবশ্য পেশাগত নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। পেশাদাররাও প্রযত্নরূপ পরিষেবা দিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রযত্নের নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে বিষয়টিকে দেখলে দেখা যাবে কোনো ব্যক্তিকে কোনো আচরণবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত -এই যুক্তিতে তার অসামর্থ্যজনিত দায়িত্ববত্তাকে এড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না।

প্রতিবেদনশীলতাঃ প্রযত্নের নীতিতত্ত্বে চতুর্থ ধাপ তথা প্রকরণট হল প্রযত্নের প্রতি গ্রহীতার প্রযত্ন তথা দাতার প্রতি প্রতিবেদনশীলতা। অর্থাৎ যিনি প্রযত্নের পরিষেবা পাচ্ছেন তিনি পরিষেবা তথা পরিষেবা-দানকারীর প্রতি সদর্থক প্রতিক্রিয়া করবেন- এবং এর মধ্য দিয়েই প্রযত্ন সার্থক হবে। অধ্যাপক ট্রোনটো আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই প্রতিবেদনশীলতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সমস্যা রয়েছেঃ প্রকৃতিগতভাবে প্রযত্ন ক্ষতি-প্রবণতা (vulnerability) এবং অসাম্য (inequality)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রযত্নের বর্তমান ধারণাটি প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তিরা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র এবং স্ব-সমর্থিত -এই ধারণার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। যে পরিস্থিতিতে একজনের প্রযত্নের প্রয়োজন হয় সেইরূপ পরিস্থিতিতে পড়ার অর্থ হল কোনো একপ্রকারভাবে ক্ষতিগ্রস্তপ্রবণ হওয়া। আকর্ষণীয় ঘটনা হল আমরা সবসময় এই অর্থে প্রযত্নকে ভাবি না। একজন আধিকারিক তার ঘরের নোংরা সরিয়ে সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। যখন ঝাড়ুদারের এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় তখনই আধিকারিকের ক্ষতিগ্রস্তপ্রবণতা প্রকাশ্যে আসে। বিভিন্ন ধরনের প্রযত্নের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবণতার ধরন বা স্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়। শিশুরা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তপ্রবণ, যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া আপন মৌলিক প্রয়োজনগুলিও মেটাতে পারে না। অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অবস্থাও একইরকম। এই ক্ষতিগ্রস্ত প্রবণতাই আমাদের এই ভাবনাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে যে আমরা সর্বতোভাবে সয়ংসম্পূর্ণ এবং সমান। বলার অপেক্ষা থাকে না যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই এমন কিছু পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলে যেখানে ক্ষতিগ্রস্তপ্রবণতা এবং পর-নির্ভরতা প্রকট হয়। যে নীতিশাস্ত্র বা রাষ্ট্রনীতি এটা ধরে নেয় যে মানুষ স্বরূপগতভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তারা মানবীয় অভিজ্ঞতার অনেকখানি 'মিস' করে। অন্যদিকে, আমরা যতই সমতার কথা বলি না কেন, আমাদের স্বীকার করতে হয় যে সব সর্বতোভাবে সমান হতে পারে না। এবং ঠিক এই কারণেই অপরের কাছ থেকে প্রযত্ন গ্রহণ করার প্রয়োজন থাকে। এই প্রযত্ন তখনই সার্থকতা লাভ করে যখন প্রযত্নপ্রদানকারী এবং প্রযত্নগ্রহীতা উভয়ের প্রয়োজন মেটানো হয়। এর অর্থ এই নয় যে এখানে নিছক পারস্পরিকতার কথা বলা হচ্ছে। প্রতিবেদনশীলতা পারস্পরিকতার তুলনায় আরো গভীর। এই প্রসঙ্গে আমরা কোলবার্গের নৈতিকতার বিকাশ তত্ত্বের পারস্পরিকতার ধারণার কেন্দ্রিকতাকে বিচার করি। কোলবার্গ বিশ্বাস করতেন যে পারস্পরিকতা ব্যতীত নৈতিক বিকাশ সম্ভব নয়। প্রতিবেদনশীলতা অপরের প্রয়োজনকে বোঝার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করে, যা কেবল অপরের অবস্থানে নিজেকে স্থাপন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবিক এই প্রকরণটি ইঙ্গিত করে যে অপরব্যক্তি যেমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে ঠিক সেইভাবেই তাদের অবস্থানকে আমরা বুঝবো। তাই, একজন

অন্যজনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিসীমার মধ্যেই আছে, কিন্তু সে ধরে নিচ্ছে না যে অপরব্যক্তি হুবহু আমার মতো। প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের এই প্রেক্ষাপটে আমরা অপরত্বের প্রশ্নগুলোকে আরো সঠিকভাবে বুঝতে পারি।

বলা বাহুল্য, যথোপযুক্ত প্রতিবেদনশীলতা আবার মনোযোগীত্বের দাবি করে। এর থেকে এটাই প্রমাণ করা যায় যে এখানে প্রযত্নের যে প্রকরণগুলির কথা বলা হল তা একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। সত্যিকারের প্রযত্নে উপরিউক্ত চারটি পর্যায় বা প্রকরণকে একে অপরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সংবদ্ধ হয়। ট্রোনটোর ভাষায় তাই বলা যায় "To act properly in accordance with an ethic of care requires that the four moral elements of care, attentiveness, responsibility, competence, and responsiveness, be integrated into an appropriate whole."[১১]

সিদ্ধান্তনুগ পর্যবেক্ষণ: সাবেকি নীতিশাস্ত্রের যে সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি তার সংশোধন ও পুনর্গঠনকল্পে নারীবাদীরা যে প্রযত্নের নীতিশাস্ত্র গঠন করেছেন তার সংযোজন এবং পরিশীলন সাবেকি নীতিশাস্ত্রের শূণ্যস্থান পূরণে সহায়ক হয় বলে নারীবাদীদের মত। বর্তমান বিশ্বে মানব জাতি যে বিচিত্র ধরনের নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই সব সমস্যার মোকাবিলা এবং সমাধানে এই নুতন ধরনের নীতিতত্ত্ব পথ দেখায়। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বতার যে জগত তাকে অতিক্রম করে পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্পর্কের উপর জোর দিতে শেখায়। বর্তমানে নারীবাদীরা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত করেছেন তা এই নীতির সাহায্যেই সম্ভব। নৈতিক নিয়ম নীতিগুলিকে কেবলমাত্র বিমূর্ত তাত্ত্বিকতার স্তরে না রেখে সেগুলির মূর্ত রূপ এই নীতির আলোকেই দেওয়ার চেষ্টা তারা করেছেন। মানব জীবনের যেকোনো নৈতিক সমস্যা যেহেতু পারস্পরিক প্রাণবন্ত সম্পর্ক নির্ভর, তাই সেই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে, সমস্যাটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, বিশেষ গুরুত্ব ও প্রযত্নের সাহায্যে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করাই শ্রেয়। প্রযত্ন নীতি যেহেতু ব্যক্তি, সমাজ কিংবা সমগ্র দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি প্রদান করে, এবং যেহেতু যেকোনো নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য হল মানুষের নৈতিক ভাল, তাই সাবেকি নীতিশাস্ত্রে প্রযত্ন নীতির সংযোজন ও পরিশীলন অপরিহার্য হয় এবং নীতিশাস্ত্র হয়ে ওঠে সকলের। তাই নারীবাদীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তি যিনি মননে ও কর্মে একইসঙ্গে ন্যায়নীতিপরায়ণ ও প্রযত্নবান হবেন তিনিই প্রকৃত অর্থে নারীবাদী বিবেচ্য হবেন। ন্যায়নীতিপরায়ণতার আদর্শের নিরিখে পাশ্চাত্যের যে সাবেকি বিচারধারা তা কেবল বিমূর্ত তাত্ত্বিক নীতিনিষ্ঠ হওয়ায় নীতি বিচারের যে মৌলিক আদর্শ ও যথার্থতা তা পূরণে সাবেকি নীতিশাস্ত্র ব্যর্থ, নীতিবিচার পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, নীতিশাস্ত্রকে সকলের বলতে নারীবাদীদের দিধাগ্রস্থ হতে হয়। সবশেষে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃতি করে বলতে হয় "দন্ডিতের সাথে দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে বিচার...।"

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Tong, R. "Feminist Ethics". In *Encyclopedia of Applied Ethics* (Vol. II.). Cambridge: Academic Press, 1998, p. 261.
২. Tong, R. "Feminist Ethics". pp. 262-264.
৩. Tong, R. "Feminist Ethics". p. 262.
৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_care (Seen on 30.04.2018).
৫. Tong, Rosemarie. "Feminist Ethics". p. 262.
৬. মৈত্র, শেফালী। নৈতিকতা ও নারীবাদঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রঃ লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৯ ।

৭. Noddings, Nel. *Caring: A feminine Approach to Ethics and Moral Education*, Berkeley: University of California Press, 1984, p. 9.
৮. Tronto, Joan. "An Ethic of Care", in *Feminist Theory: A Philosophical Anthology*. Blackwell, 2007, pp. 251-256.
৯. Little, Pat. *Simone Weil: Waiting on Truth*, New York: St. Martin's Press, 1988, p.130.
১০. Tronto, Joan. "An Ethic of Care", p. 254.
১১. Tronto, Joan. "An Ethic of Care", p. 255.